সাম্প্রতিক সহিংসতা : চাই মানসিক সুস্থতা

পরীক্ষিৎ চৌধূরী

সম্প্রতি সাভার-খাগড়াছড়ি-সিলেট-নোয়াখালী। দেশের এই চারটি অঞ্চলের নাম সবার মুখে মুখে ফিরছে। ইতিবাচক কোনো কারণে নয়, বরং এই অঞ্চলগুলোতে সংঘটিত কয়েকটি ঘটনা সারা দেশে নিন্দার ঝড় তুলেছে। হঠাৎ করেই যেন বেড়ে গেল নারী নির্যাতন, যদিও এ জাতীয় নির্যাতন বা ধর্ষণ আমাদের এই শান্ত বদ্বীপে মাঝে মাঝেই ঘটছে। নির্যাতনকারীরা কিন্তু রেহাই পাচ্ছে না। ধরা পড়ছে। বেশ কিছু ঘটনার দ্রুত বিচারও হয়েছে। তারপরও থেমে নেই এহেন ঘৃণ্য অপরাধ। কিন্তু কেন এই পাশবিকতা? সমাজবিজ্ঞানীরা এবং মনোবিদগণ এ নিয়ে বিস্তর গবেষণাও করছেন। সমাজের অবক্ষয়ের কথা বলা হচ্ছে, অপরাধীদের মনস্তত্ব নিয়েও জোরোসোরে আলোচনা চলছে । সাধারণ মানুষও জানে, নারীর ওপর সহিংসতা এক ধরনের চরম মানসিক বৈকল্যের বহিঃপ্রকাশ। মানসিক অসুস্থতা নিয়ে শুধু আমাদের দেশে না, সারা বিশ্বেই নারীর ওপর ঘটে চলেছে বহুমাত্রিক জঘন্য অপরাধ। শিশু-কিশোরী-তরুণী-বৃদ্ধা কেউই বাদ যাচ্ছে না এই সহিংসতা থেকে। আবার দেখা যাচ্ছে, এই অপরাধের সাথে জড়িত থাকছে কিশোর-যুবক-বৃদ্ধসহ সব পর্যায়ের বয়সি পুরুষ। তবে এই মানসিক বৈকল্য বেশি লক্ষ্য করা যায় তরুণদের মধ্যে। আর এই দিকটাতেই এখন নজর দেওয়ার সময় এসেছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা নিয়েই স্বাস্থ্য। কিন্তু আমরা ভুলে যাই সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে মানসিক ও সামাজিক সুস্থতাও দরকার। মানসিক সুস্থতা ছাড়া সার্বিক সুস্থতা সম্ভব নয়। মানসিক সুস্থতা হলো মন ও মনন, আবেগ ও আচরণের সুস্থতা। জাতিসংঘ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা তিন নম্বরে —সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ অর্জনের ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আমাদের সরকারও এসডিজির এই লক্ষ্যমাত্রা ৩.৪ -এর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী আরেকটি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা হচ্ছে প্রতিবন্ধিতা। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যনীতি ও কর্মসূচিতে এ দু'টি বিষয়কেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আমাদের জনগোষ্ঠীর অর্ধেক ১৮ বছরের নিচে। ২০১৮ সালে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট থেকে এক গবেষণায় দেখা যায়, শিশু-কিশোরদের মধ্যে ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ মানসিক রোগী। আট কোটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক কোটি ৩৬ লাখ শিশু-কিশোর মানসিক রোগী। বিশ্বের প্রতি পাঁচজনে একজন বা ২০ শতাংশ তরুণ মানসিক রোগে আক্রান্ত। বিষণ্নতা, উদ্বেগ, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যার চেষ্টা, অতি চঞ্চলতা, বুলিং, সাইবার ক্রাইম, গ্যাং কালচার, অবাধ্যতা, দেশীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ, ইন্টারনেট ও ফেসবুক আসক্তি, সম্পর্কজনিত মানসিক সমস্যা থেকে এ রোগের সৃষ্টি।

আরো একটি ভয়াবহ তথ্য হল, দেশের ৮২ শতাংশ শিশু বুলিংয়ের মধ্যেই বড়ো হয় যা তাকে পরবর্তীতে মানসিকভাবে অসুস্থ করে তুলতে প্রভাব ফেলে। মানসিক রোগ, যৌন হয়রানির শিকার, বুলিংয়ের মধ্যে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরের মানসিকতা ভঙ্গুর হবে, এটাই স্বাভাবিক।

মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সাম্প্রতিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার এবং এর ওপর অত্যধিক নির্ভরতা বিশেষ করে, মোবাইল, ফেসবুক, ইন্টারনেটের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার মানসিক রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। পাশাপাশি মাদকাসক্তিও একটি বড়ো কারণ যা তরুণদের মধ্যে মানসিক সুস্থতার ব্যাঘাত ঘটায়। বর্তমানে শিশু-কিশোর-তরুণরা যে হারে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছে তার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহারকে অনেকটা দায়ী করছেন মনোবিজ্ঞানীরা । তাঁরা মনে করেন, শারীরিক পরিশ্রম না করে এভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ফলে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তারা বড়ো হয়ে সমাজে নানাবিধ জঘন্য অপরাধ ঘটিয়ে থাকে।

শিশু থেকে কিশোর ; কিশোর থেকে তরুণে পরিণত হওয়ার সময় মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। একটি বয়:সন্ধিকালীন সংকট তৈরি হয়। সময়টা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। এ জন্য এ সময় মানসিক শুশ্রূষার প্রয়োজন। পরিবার, বন্ধু -বান্ধব ও শিক্ষককে এই দায়িত্ব নিতে হবে।

অনেক সময় মনের ভেতর পুষে রাখা কথা বলতে না পেরেও মানসিক রোগে আক্রান্ত হয় কেউ কেউ। ফলে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। মাদকে আকৃষ্ট হয়। এমন একটি ঘটনা এক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পড়তো সে। হঠাৎ করে এক সেমিস্টারে সে ফল খারাপ করল। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল সন্তানটি মাদকাসক্ত। মা তখন কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে সংসার ফেলে রেখে সন্তানকে দেখভাল করা শুরু করলেন। ততদিনে পরিবিরে নেমে এসেছে ভয়াবহ বিপর্যয়। এ পরিস্থিতিতে মা -বাবাকে বুঝতে হবে সন্তানের কী অবস্থা। এজন্যই সন্তানের মানসিক সুস্বাস্থ্য নিয়ে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে।

দেশে মানসিক রোগের চিকিৎসার বড়ো বাধা হল অসচেতনতা এবং সামাজিক ধ্যান ধারণার কারণে রোগ গোপন রাখার চেষ্টা। এক জরিপে দেখা গেছে এসব সমস্যার কারণে একজন রোগী তার রোগের লক্ষণ প্রকাশ হবার পর থেকে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়া পর্যন্ত ৬ বছর সময় লেগে যায়। আমাদের জন্য বড়ো সমস্যা হলো , বাংলাদেশে কমিউনিটি পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কোনো ফোরাম বা সংগঠন নাই। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের দেশে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; বিভিন্ন এনজিও; পেশাজীবি সংগঠন; বেসরকারি ট্রাষ্ট ও ফাউন্ডেশন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

সামাজিক অপরাধ শুধু শহরে নয়, গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে ছে ব্যাপক হারে। তাই মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রমে গ্রামের দিকে সুনজর দেওয়া প্রয়োজন। গ্রামীণ ডাক্তাররা প্রান্তিক পর্যায়ের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই বিশাল অপ্রশিক্ষিত গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদেরকে মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ পেশাদার করে তৈরি করা অপরিহার্য। সরকারও এক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে গত দুই দশকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, মসজিদের ইমাম ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে তৃণমূল পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এ পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে প্রায় ৫০০০ স্বাস্থ্যকর্মী, ৪০০০ ডাক্তার, ৫০ সিভিল সার্জন ও ২০০ ইমাম মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। হাসপাতালের দেওয়া পরামর্শে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো অব্যাহত ফলোআপ সেবা দিতে পারে বলেও মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের কমিউনিটি ক্লিনিক বর্তমানে সার্বজনীন স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রদানে একটি কার্যকর মডেল হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, যাতে প্রতিরোধমূলক মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মৌলিক সেবা অন্তর্ভুক্ত। এই কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবন।

দেশে মাত্র ৬০জন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট র য়েছেন। মানসিক স্বাস্থ্য বিষ য়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাধারণ চিকিৎসক রয়েছেন ১০ হাজার এবং নার্সের সংখ্যা ১২ হাজার। আর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা য় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাধারণ চিকিৎসক র য়েছেন মাত্র ৬০ জন। মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের জন্য পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে দিয়ে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা করছে সরকার। জেলা পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্য রিভিউ মনিটরিং কমিটি গঠনের বিষয়টিও বিবেচনা করছে সরকার, যার সভাপতি হবেন জেলা প্রশাসক।

তারুণ্যের আগেই শৈশব বা কৈশোরকাল থেকে এ ধরণের সেবা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে খন্ডকালীন বা স্থায়ী মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী বা বিশেষজ্ঞ রাখার বিষয়টি বিবেচনার দারি রাখে।। মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক বৈকল্য বা বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ বিষয়ে প্রচারণার জন্য প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলভিত্তিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে এ নিয়ে কাজ করছে সরকার। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যসহ, আইনজীবী, বিচারক, গণমাধ্যমকর্মীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো জরুরি।

সরকার ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩’ এবং ২০১৮ সালে ‘মানসিক স্বাস্থ্য আইন’ প্রণয়ন করেছে। মানসিক স্বাস্থ্য আইনে র মধ্যে সংকট প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা য় মানসিক সহা য়তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারের এখনকার পরিকল্পনা হলো কৌশলগত পরিকল্পনার স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিশ্চিত করা এবং শৈশব থেকে রেজিলিয়েন্সি ও কমিউনিটির কল্যাণ বৃদ্ধির ওপর আলোকপাত করা , যা মানসিক সুস্থতা নিশ্চিতের মূল উপাদান। বহু অংশীদারভিত্তিক, সামগ্রিক ও সার্বিক কমিউনিটিভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি ‘মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় কৌশল পরিকল্পনা’ প্রণয়নের কাজ করছে সরকার। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ ক্ষেত্রে তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা বিনিময়ে এগিয়ে আসবে এবং কারিগরি ও আর্থিক সম্পদ শনাক্তকরণে সহায়তা করবে বলে বাংলাদেশ আশা করে।

সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় ৭২তম বিশ্ব স্বাস্থ্য স ম্মেলনে বাংলাদেশে মানসিক চিকিৎসার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাজীবীর সংখ্যা খুবই কম। সামাজিক নিন্দা ও পেশাজীবীর অভাব সত্ত্বেও সমাজের কাছে পৌঁছার উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ ড়ে তোলার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি জানান, এই জটিল ও বহুমুখী ইস্যু মোকাবিলা করতে জরুরিভিত্তিতে কার্যকর অংশীদারদের সঙ্গে সমন্ব য়ের ওপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে । সরকারের কর্ণধাররা মানসিক স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিতে এবং সকল নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) কাছে মানসিক রোগীদের সঠিক চিকিৎসায় ঘাটতি কমাতে সহায়তা আশা করে।

এই বছরের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস এমন এক সম এসেছে যখন করোনাভাইরাস মহামারির ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বড়ো ধরনের পরিবর্তন ঘটে গেছে। মহামারির প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক পরিবর্তনের কারণে খাপ খাওয়াতে না পেরে তরুণদের মাঝে মানসিক রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা করেছে ডব্লিউএইচও।

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেন্টাল হে লথ বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে সবার জন্য ‘মানসিক স্বাস্থ্য : অধিক বিনিয়োগ অবাধ সুযোগ’। মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এখনকার চে য়ে আরও বেশি বিনি য়োগের প্রয়োজন যাতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবাতে প্রত্যেকেরই অধিকার নিশ্চিত করার কথাই এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতি বারবার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক্ষেত্রে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত হলো, একই ব্যক্তির মধ্যে দুই বা ততোধিক রোগের উপস্থিতির ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা অন্যান্য রোগ নিরাময়ে সহায়ক হয়। সেই সাথে সার্বজনীন স্বাস্থ্য কর্মসূচির অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রায়ই মানসিক স্বাস্থ্য ও প্রতিবন্ধিতাকে বাদ রাখা হয়। কিন্তু মানসিক রোগ প্রতিরোধে আমাদের প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী ও দক্ষ সেবাদান ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সামাজিক, পারিবারিক, ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে। আর এর প্রভাব পড়ছে তরুণদের ওপর। তরুণ হলো সেই শক্তি যে শক্তি সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে । এই তারূণ্যের উত্তাল কালকে বেশি নজর দিতে হবে। অসুস্থ বা মানসিক বিকারগ্রস্ত তারুণ্য সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, যা সাম্প্রতিক যুবশক্তির মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে এ কটি কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব।

#

০৭.১০.২০২০ পিআইডি ফিচার